সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● পঞ্চম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ● জুন-জুলাই ২০১৯ ● পাঁচ টাকা

ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার বাজেটে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়বে

এদেশের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ বাজেট(২০১৯-২০ অর্থবছর) গত ৯ জুন জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে। বড় বাজেট উত্থাপন করে শাসক দল যখন স্মিত হাস্যে, স্ফীত বুকে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন, তখন এদেশের শ্রমিক-কৃষক, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ আবার তীব্র অনিশ্চয়তা আর শঙ্কার মধ্যে পড়েছেন। বাজেট বলতে এদেশের সাধারণ জনগণ অর্থনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝেন না এটা ঠিক। কিন্তু তারা বুঝেন যে, কোন কাজ করতে হলে তার আয় কোন খাত থেকে আসবে এবং কোন খাতে কী পরিমাণ ব্যয় হবে তার একটা পরিকল্পনা। বুর্জোয়া অর্থনীতির একাডেমিক আলোচনায় প্রবেশ না করলেও এটাই বাজেটের মূল কথা। বাজেটের মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশ ধনী ও গরিব (শ্রমিক ও মালিক) এ দু'ভাগে বিভক্ত। তাই কোন একটি সিদ্ধান্ত বা ঘটনা কোন ভাবেই উভয় শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। আর এ সত্যকে ভুলে গেলে বাস্তবের যথার্থ উপলব্ধি তৈরি হয় না। আজকে যখন সরকার আওয়াজ তুলছে "সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ/ সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের"–তখন মেহনতি মানুষদের

যুক্তি বিজ্ঞানের আলোকে নির্ধারণ করতে হবে সমৃদ্ধিটা আসলে কার? মেহনতি জনতার না ধনিক শ্রেণীর?

দাম বাড়বে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের

২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার বাজেট ঘোষিত হয়েছে। এ বাজেটে ঘাটতি দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকা। বাজেটের অধিকাংশ অর্থের যোগান হবে জনগণের পকেট থেকে। যে টাকা ট্যাক্স আকারে সরকার জনগণকে দেয়, সেই খাত থেকে। তাহলে বাজেটের অর্থ যোগানদাতা জনগণের জন্য কী আছে এই বাজেটে? আগামী অর্থবছরের বাজেটে বেশকিছু পণ্যের আমদানি শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্যাকেটজাত তরল দুধ, গুঁড়ো দুধ, আমদানি করা কাঁচা চিনি ও প্রক্রিয়াজাত চিনি, প্রাকৃতিক মধু, সব ধরনের অলিভ অয়েল, এসি মোটর, প্রক্রিয়াজাত মিল্ড খাদ্য, ফ্লাস্ক, বোতল, জার, প্রট, গ্লাস, রান্নার ওভেন ও চুলা। ফলে এসব পণ্যের দাম বাড়তে পারে আসছে অর্থবছরে। আমদানি করা ভোজ্যতেল, প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়াম পণ্য এতদিন মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট অব্যাহতি পেয়ে আসছিল। কিন্তু ভ্যাট আরোপের ফলে আমদানি করা সয়াবিন তেল, পাম অয়েল, সূর্যমুখী তেল ও সরিষার তেলের দাম বাড়তে পারে। নতুন করে ৫ শতাংশ ভ্যাট প্রস্তাবে অস্থির হয়ে উঠেছে গরম মসলার বাজার। অর্থমন্ত্রীর বাজেট ঘোষণার পরপরই বেড়ে গেছে প্রায় সব ধরনের মসলার দাম। বর্তমানে আমদানি করা গরম মসলায় ৬০ শতাংশ শুল্ক *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ধানের ন্যায্য মূল্য নেই
বাম্পার ফলনেও বাম্পার কষ্ট কৃষকের

স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি–কবি শামসুর রাহমান কৃষকের হাসির মাঝে এভাবে স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ফসলের মাঠে। সেই ফসলের মাঠে আজ কৃষকের হাসি নয়, দাউ দাউ আগুন জ্বলে। বীজ বোনা থেকে চারা রোপণ, সময়ে সময়ে নিড়ানি–এভাবে ধান পাকা পর্যন্ত প্রতিটি সময় সন্তানের মতো পরম আদরে একজন কৃষক ফসলের মাঠ সুরক্ষিত রাখেন। উৎপাদিত সেই ধান এদেশের ১৬ কোটি মানুষের বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। যে কৃষক আমাদের বেঁচে থাকার রসদ জোগায়–তাঁরা কীভাবে বেঁচে আছে? রক্ত জল করা পরিশ্রমে ফসল ফলানোর পর কৃষক নিজেই সেই ফসলের মাঠে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন! কতটা ব্যথা ও অভিমান বুকের মধ্যে সঞ্চিত হলে কৃষকেরা এই কাজ করতে পারেন, তা বোঝার মতো মন মন্ত্রীমশাইদের নেই। তাই তারা ঠাট্টা-মশকরা করেন। আগুন দেয়া ধানক্ষেতের ছবি বাংলাদেশ নয়, ভারতের হিসেবে উড়িয়ে দেন। কখনো এখানেও 'সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার ষড়যন্ত্র' খুঁজে পান। শুধু খুঁজে পান না কৃষকের মুখ। কী অব্যক্ত যন্ত্রণা চোখে-মুখে, শীর্ণকায় শরীর আগামী দিনের দুশ্চিন্তায় আরও শীর্ণ হয় দিনকে দিন। এইভাবেই আজ আমাদের দেশের কৃষকরা দিনাতিপাত করছেন। যতবেশি ফসল ফলে, কৃষকের কষ্ট তত বাড়ে।

এবছরও বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে। রেকর্ড ২ কোটি টন ধান উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু ফসলের ন্যায্যমূল্য তো দূরের কথা এমনকি উৎপাদন খরচও তুলতে পারছে না কৃষক। প্রতি মণ ধান উৎপাদনে ৮০০ টাকা খরচ হলেও বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে ৫০০-৬০০ টাকা মণ ধরে। বছরের পর বছর ধরে লোকসান গুণে গুণে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন ছোট ও মাঝারি কৃষক। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কৃষকদের রক্ষার কোন কার্যকর *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রামপাল-রূপপুরসহ প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী সকল প্রকল্প বন্ধ কর

তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহবায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ ১৬ জুন এক বিবৃতিতে বলেছেন: '২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে সরকার বিভিন্ন ব্যয়বহুল প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দিয়েছে। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, সরকার উন্নয়নের নামে এমন অনেক প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যেগুলো দীর্ঘমেয়াদে দেশের জন্য শুধু আর্থিক বোঝাই সৃষ্টি করবে না, প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশ করে দেশ ও জননিরাপত্তাকে বিপর্যস্তও করবে। যেমন উন্নয়নের কথা বলেই সরকার এখনও সুন্দরবন বিনাশী রামপাল প্রকল্প অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বদরবারে মিথ্যাচার করে আরও তিন শতাধিক, সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য, বিপজ্জনক প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। রামপাল প্রকল্প নিয়ে সরকার জনগণের কাছে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে, ইউনেস্কোকে দেয়া বিশ্ব ঐতিহ্য রক্ষার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে হেয় করেছে। সরকারের এই ভূমিকায় একদিকে বাংলাদেশ অরক্ষিত হচ্ছে অন্যদিকে সুন্দরবন তার বিশ্ব ঐতিহ্য মর্যাদা হারাতে বসেছে।

সরকার উন্নয়ন সাফল্যের বয়ানে যেসব প্রকল্পকে গৌরবান্বিত করছে তার মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প অন্যতম। এই প্রকল্প প্রথম থেকে অনিয়ম, অস্বচ্ছতা, গোপনীয়তা ও জবরদস্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি এই প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা এর খুবই ছোট অংশ। উপরন্তু বিশ্বের পারমাণবিক শক্তির প্রথম সারির দেশগুলো যখন উচ্চ ব্যয়বহুল এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বলে এই পথ থেকে সরে আসছে তখন বাংলাদেশের মানুষের ওপর ভয়াবহ ঋণের বোঝা চাপিয়ে, ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত না করে, প্রকল্প সংলগ্ন কোটি মানুষকে প্রত্যক্ষ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে, পদ্মা নদী এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশকে মহাবিপদে নিক্ষেপ করে এই ব্যয়বহুল প্রকল্প নিয়ে উচ্ছাস ছড়ানো এক নির্মম পরিহাস বলে আমরা মনে করি। রামপাল, রূপপুর মাতারবাড়ীর এসব প্রকল্পকে আমরা উন্নয়ন নয় ধ্বংস প্রকল্প বলে মনে করি এবং উন্নয়নের নামে প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য জনগণের অর্থ বরাদ্দ দেয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। একই সঙ্গে এসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ জাতীয় কমিটি প্রস্তাবিত পরিবেশসম্মত সুলভ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় করার দাবি জানাই।

ধনিকশ্রেণীর বাজেটে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়বে

(১ম পৃষ্ঠার পর) পরিশোধ করছেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু আগামী অর্থবছর থেকে মসলা আমদানিতে ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে বাজেটে। এ কারণে বাজেট ঘোষণার পর থেকে জিরা, দারচিনি, মিষ্টি জিরা, এলাচ, জয়ত্রী ও গোল মরিচের দাম বেড়ে গেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় এসকল পণ্যের দাম বাড়ার ফলে জনজীবন অস্থির হয়ে উঠবে।

বড় বাজেটের আড়ালে অর্থনৈতিক অস্থিরতা

সরকার জোর গলায় প্রচার করছে যে, এবার তারা বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ বাজেট প্রণয়ন করেছে। অথচ এই বৃহৎ বাজেটের আড়ালে লুকিয়ে আছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির চরম অস্থিরতা । ফলে আজ যে বাজেট তারা প্রণয়ন করেছে, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পরের বার তাদেরকে আরও বড়, তার পরের বার তার চেয়েও বড় বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। ফলে বাজেটের আকার দেখিয়ে জনগণকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করলেও জনগণের উপর তার কু-প্রভাব বর্তাতে বাধ্য। বর্তমান বাজেট পর্যালোচনা করলে তাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বুর্জোয়া অর্থনীতিতে সুষম ও অসম বাজেট–এ দু'প্রকার বাজেট আছে। সরকারের আয়ের সাথে ব্যয় সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। আর আয়-ব্যয় সমান না হলে তাকে অসম বাজেট বলে। অসম বাজেট আবার ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত বাজেটও হতে পারে। সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী বিশ্বে কোথাও কোন সরকার সাধারণভাবে আজ আর সুষম বাজেট কিংবা উদ্বৃত্ত বাজেট প্রণয়ন করতে পারে না। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোটা অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে ঋণের উপর। তীব্র বাজার সংকটে নিপতিত বুর্জোয়া অর্থনীতিকে রক্ষা করতে এখন বলা হচ্ছে 'ঘাটতি বাজেট'ই উত্তম। এতে ওই দেশের অর্থনীতিতে যেমন কৃত্রিম তেজী ভাব তৈরি করা যায়, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের পুঁজি রপ্তানি এবং আগ্রাসনও একটা বৈধতা পেয়ে যায়। কারণ ঘাটতি বাজেট হলে আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এ টোটকা দাওয়াইও শেষ রক্ষা করতে পারে না। অতিরিক্ত ঋণ (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) গোটা অর্থনীতিকে অস্থির করে তোলে। বাংলাদেশ এই সংকটে পড়েছে। "আগামী অর্থবছরে ১ লাখ ৩৮ ২১২ কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে সরকার। এর মধ্যে বিদেশী ঋণ ৬৩ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকা, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ২৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয়া হবে।" তাহলে এর ৬০ ভাগই আসছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ বেশি, তা পরিশোধ করতে গিয়ে বিনিয়োগ কমে যাওয়া ও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যার ফলে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরাই ধারণা করছেন, এভাবে চললে আগামী ৪/৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় ধরনের ধাক্কা খাবে। আর তা সামাল দেয়ার জন্যে তারা প্রস্তাব করছেন রাজস্ব আয় বাড়াতে। সরকার রাজস্ব আয় বাড়াতে গিয়ে নানাভাবে করারোপ করছে, বিভিন্ন সময়ে করের হার বাড়াচ্ছে, এবার প্রত্যক্ষ করের আওতায় ৪ কোটি মানুষকে আনার প্রস্তাব করেছে। বর্তমানে দেশের জিডিপির তুলনায় কর আদায়ের হার ১০ শতাংশ। যাকে অন্তত ১৫ থেকে ১৬ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করছেন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা। ইতোমধ্যেই পরোক্ষ করে জনগণ বিপর্যস্ত। শুধুমাত্র মোবাইলে ১'শ টাকা ব্যবহার করলে ২৭ টাকা পরোক্ষ কর দিতে হয়। এমনকি সরকার বিভিন্ন কর্পোরেট হাউজের ওপর যে কর আরোপ করে সেটাও পরোক্ষ করের মারপ্যাঁচে বাস্তবে জনগণকেই দিতে হয়। এখন সরকার প্রত্যক্ষ করের আওতা বাড়ানোর কথা বলছে, লক্ষ্যসীমা নির্ধারণ করেছে ৪ কোটি মানুষ। ৪ কোটি মানুষের কাছ থেকে কর আদায়ের বাস্তব কোন প্রেরিস্থিতি নেই, একথা বলছে সিপিডি। তাই রাজস্ব আয় বাড়িয়ে এ সংকট সমাধানের সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। ফলে সরকার বিদেশী ঋণের দিকে হাঁটবে। বিদেশী ঋণ মানেই শর্ত, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। আর এই ঘাটতি পূরণের জন্য ক্রমাগত আরও ঋণ করতে হয়, সেটা পূরণের জন্য আরও ঋণ করতে হয়। যার ফলে বাজটের আকার ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ফলে গোটা অর্থনীতিই এক সংকটের মধ্যে আছে। যার বোঝা বহন করতে হবে জনগণকে ।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতসহ সেবাখাতসমূহে বাণিজ্যিকীকরণ ত্বরাণিত হবে

চলতি কথায় শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। ইউনেস্কো'র ঘোষণা মতে, দেশের শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ২৫ ভাগ বরাদ্দ করার কথা। আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রআন্দোলন থেকে বারবার এ দাবিটি উচ্চারিত হচ্ছে। সরকার এর যৌক্তিকতা সরাসরি অস্বীকার না করলেও তা বাস্তবায়ন করছে না। বাজেট বক্তৃতায় বলা হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে 'মেইজি বিপ্লব' সংগঠিত করা হবে। জাপানের সম্রাট মেইজির মত এদেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে, এমনকি তার জন্য বিলেত থেকে শিক্ষক 'আমদানি' করা হবে! অথচ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ২৪ হাজার ৪০ কোটি টাকা। প্রয়োজনের তুলনায় এই বরাদ্দ অপ্রর্যাপ্ত। তাহলে চলবে কি করে? চলার একমাত্র উপায় ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ। আমরা পূর্বেই দেখেছি সরকারের বরাদ্দ যত কমেছে, ততই বেড়েছে দেশি-বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ। যার ফলে ক্রমাগত শিক্ষাব্যয় যেমন বেড়েছে একইভাবে সংকোচিত হচ্ছে শিক্ষার অধিকার। সরকার একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা বললেও কূপমণ্ডূক মাদ্রাসা শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করছে। এ বাবদ এবারের বাজেটে বরাদ্দ করেছে ৫ হাজর ৭৫৮ কোটি টাকা (কারিগরি ও মাদ্রাসা),আর নির্মাণ করা হচ্ছে মাদ্রাসার নতুন ১৮'শ ভবন। অন্যদিকে ডিজিটালাইজেশনের নামে কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তির উপর জোর দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলানোর জন্য এখন 'শেখানো হবে ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেনোলজি, রোবোটিঙ, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স....ব্লকচেইন টেকনোলজি ইত্যাদি'। ফলে বাজেট পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট যে, শিক্ষাখাতে দেশি-বিদেশি পুঁজির আবাধ অনুপ্রবেশ ঘটবে, আর একটা পশ্চাৎপদ ভাবমানসের সাথে বিজ্ঞানের কারিগরি দিকটি সংমিশ্রণ ঘটানো হবে; যা ফ্যাসিবাদী শাসনের সাংস্কৃতিক জমিন তৈরি করবে। এর ফলে লাভবান হবে এদেশের বৃহৎ পুঁজিপতিরা। একই চিত্র স্বাস্থ্যখাতে। টাকার অভাবে মানুষ চিকিৎসা করাতে পারে না, প্রয়োজনীয় ঔষধ কিনতে পারে না। এমতাবস্থায় সরকারি উদ্যোগে মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল সরকারের। কিন্তু সরকার সে পথে হাঁটলো না। চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মোট বাজেটের মাত্র ৪.৯ শতাংশ। সাধারণ মানুষের জন্য সরকার এ খাতে বিশেষ কোন ব্যবস্থা না নিলেও ঔষধ শিল্প রক্ষার নামে ঔষধ কোম্পানির মালিকদের জন্য ঠিকই ২০ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করেছে। সরকার গর্ব করে ঘোষণা করছে, তারা সারা দেশে ১১১টি মেডিকেল কলেজ গড়ে তুলেছে, অথচ ভুলে যাচ্ছে এর মধ্যে ৭৭টি কলেজই প্রাইভেট। এই প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা ব্যয় যেমন বেশি, একইভাবে যারা শিক্ষার্থী, তাদেরও গুণতে হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। অপরদিকে সরকারি মেডিকেলগুলোতে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অবকাঠামো স্বল্পতা আমাদের সবার জানা। ফলে চিকিৎসা খাত সম্পূর্ণটাই প্রায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলছে।

উপেক্ষিত কৃষি এবং কৃষক

বাজেট প্রণয়নের পূর্বে এদেশের কৃষি ও কৃষকের দুরবস্থার চিত্রটি অত্যন্ত নগ্নভাবে সকলের সামনে এসেছিল। প্রত্যাশা ছিল আসন্ন বাজেট অন্তত কৃষক ও কৃষিবান্ধব হবে। কিন্তু সেই আশায় গুড়েবালি। বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক দেশ। খোদ বাজেট বক্তব্যেও বলা হচ্ছে, "কৃষি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জীবনীশক্তি; দেশের মোট শ্রম শক্তির ৪০.৬২ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত"। এ বাস্তব সত্য, একে অস্বীকার করা যায় না, অর্থমন্ত্রীও পারেননি। কিন্তু তারপরও বাজেটে যে বরাদ্দ ও নীতি গ্রহণ করা হলো, তা কোনক্রমেই কৃষকদের উপযোগী নয়। এবার কৃষিখাতে মোট বাজেটের মাত্র ৫.৪ শতাংশ বরাদ্দ করার প্রস্তাব করেছে। খোদ কৃষকদের জন্য বরাদ্দ না করলেও কৃষিপণ্য রপ্তানিকারী ব্যবসায়ীদের জন্য ২০ শতাংশ প্রণোদনার সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমান কৃষিখাতের অবস্থা ও বাজেট পরিস্থিতি মূল্যায়ন করলে দেখা যায় বাংলাদেশ সরকারের কৃষিনীতির কারণে প্রতি বছর নিঃস্ব-রিক্ত হচ্ছেন হাজার হাজার কৃষক। কৃষকরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যে ফসল উৎপাদন করেন, তার ন্যায্যমূল্য পান না। কিন্তু একথা দিয়ে লোকসানের প্রকৃত চিত্র অনুধাবন করা যাবে না। যেমন এবছর বোরো ধান উৎপাদন হয়েছে রেকর্ড ২ কোটি টন, আর সরকার কিনবে মাত্র দেড় লাখ টন। তাও এর মধ্যে বেশিরভাগটাই চাল কিনবে। ফলে উৎপাদিত ফসলের ব্যাপক অংশ কৃষককে খোলা বাজারে বিক্রি করতে হয়। এক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটে তা হলো, কৃষকের প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে খরচ পড়ে ২৫ টাকা করে, সরকার অবশ্য কিনে ২৬ টাকায়। কিন্তু সরকার কতটুকু ক্রয় করে তার চিত্র তো উপরেই আছে। ফলে বিপুল প্ররিমাণ উৎপাদিত ফসল নিয়ে কৃষক বিপদে পড়েন। অপরদিকে ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত আয়োজনও নেই। তাই বাধ্য হয়ে কৃষকদের মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে ধান বিক্রি করতে হয়। তারা কেজি প্রতি প্রায় অর্ধেক দামে অর্থাৎ ১৪/১৫ টাকা দিয়ে ক্রয় করে। ফলে প্রতি বছরই সাধারণ ও মাঝারি কৃষকরা লোকসানের মুখে পড়ে। আবার কৃষি উৎপাদনের জন্য সার, সেচ, কীটনাশকসহ প্রয়োজনীয় উপাদান সরকার প্রদান করে না, তাই প্রতি বছর কৃষিঋণ নিতে হয়। ফলে একদিকে কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, আরেক দিকে ক্রমাগত ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু কৃষকদের রক্ষায় সরকারের কোন উদ্যোগ নেই।

বেকার সমস্যার সমাধান হবে কি?

বর্তমানে দেশের কর্মক্ষম বেকারের সংখ্যা ৪ কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার জন। এই বেকারত্বকে পুঁজি করে শাসক দল ঘরে ঘরে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, কিন্তু তার সমাধান তো হয়ইনি, বরং বেড়েছে। বেকারত্বের অভিশাপ কি ভয়াবহ তা আমরা টের পাই যখন মালয়েশিয়ার গণকবরে কিংবা সমুদ্রে হাজার হাজার বাংলাদেশি বেকারের সলিল সমাধির খবর আসে। এবারের বাজেটেও বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কোন কার্যকর প্রদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বাজেট প্রণয়নকালে অর্থমন্ত্রী সমস্যাটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন। তিনি বলছেন 'একদিকে শ্রমবাজারে বিপুল কর্মক্ষম জনশক্তির আগমন, অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের চাহিদা কমে যাওয়ার বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে।' নিজেদের ব্যর্থতার দায় প্রযুক্তির উপর চাপিয়ে দিলেন। বাজেটে বিশেষ ১'শটি অর্থনৈতিক জোন কার্যকর হলে বেকার সমস্যা সমাধান এবং আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবার অলীক স্বপ্ন দেখানো ছাড়া আর বিশেষ কোন প্রস্তাবনা নেই। আবার দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়ে এখন বিশ্বের ৫৩টি শ্রমশক্তি রপ্তানির কথা ভাবছেন। বাস্তবে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ নিয়মেই প্রতিনিয়ত বেকারের সংখ্যা বাড়ে। তাই নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, আগামীদিনে বেকার সমস্যা আরও তীব্র হবে।

আপনার ঋণ কত?

প্রশ্ন শুনে আৎকে উঠলেন! না, আপনার ব্যক্তিগত কোন ঋণের কথা বলা হচ্ছে না! ভাবছেন তাহলে আবার ঋণ কি? আপনি ব্যক্তিগতভাবে ঋণ করুন আর না করুন, আপনার দু'বেলা খাবার জুটুক আর না জুটুক ঋণ কিন্তু আপনার আছে। তাও অল্প নয়, ৬৭ হাজার ২৩৩ টাকা। কি তাজ্জব ব্যাপার? এ কিভাবে সম্ভব? বুঝলেন না, এ হলো রাষ্ট্রের ঋণ। যা অবধারিতভাবে আপনার মাথায় পড়েছে। এবারের বাজেটে সরকার ঋণ পরিশোধ বাবদ বরাদ্দ করেছে টাকা। যা বাজেটে কোন একক খাত হিসেবে তৃতীয়। সেদিক থেকে দেখলে "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ১৭ লাখ। এ হিসেবে প্রতিটি নাগরিকের মাথাপিছু ঋণ ৬৭ হাজার টাকা, আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ৬০ হাজার টাকা। এ হিসেবে ১ বছরে বেড়েছে ৭ হাজার ২৩৩ টাকা।" প্রস্তাবিত এ বাজেটে আগামী বছর তা আরও ৫ হাজার ৫৮৭ টাকা করে বাড়বে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই ঋণ প্ররিশোধ বাবদ মোট বাজেটের ১০ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। ফলে আপনি অবগত থাকেন বা না থাকেন, এই ঋণের বোঝা আপনাকে বইতে হবে।

শাণিত হবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ঘাটতি বাজেট বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণিকে ক্রমাগত ঋণের দিকে ঠেলছে। গোটা বাজেট মূল্যায়ন করলে এ চিত্রটি আরোও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু ঋণ নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে যে সকল প্রকল্প নেয়া হচ্ছে, তার সাথেও জড়িয়ে আছে এ শক্তিগুলো। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকার এখন গ্যাসের ওপর চাপ কমানোর কথা বলে কয়লা বা পারমাণবিক উৎসের দিকে যাচ্ছে। রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহেশখালি ও মাতারবাড়ি প্রকল্পগুলো নির্মাণের কাজ বহুজাতিক কোম্পানি সম্পন্ন করবে। সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কোম্পানির সাথে ৪টি চুক্তি সম্পাদন করেছে। সারাদেশে যে ১'শটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে, তাও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে। শুধু তাই নয়, রেল-সড়ক যোগাযোগের কাজটাও একইভাবে সম্পাদিত হবে। এখানে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো প্রধানত সম্পাদিত হবে ভারত, রাশিয়া ও চীনের কোম্পানিসমূহের দ্বারা; যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতি প্রবাহেরও নির্দেশক। ফলে সরকার যে উন্নয়নের প্রচার করছে, তা বাস্তবে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দেবে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যেমন তীব্র হবে, তেমনি রাজনীতিতে শাণিত হবে ভারত-চীন-রাশিয়াসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রবল আধিপত্য।

এ বাজেট জনস্বার্থ বিরোধী

ভোট ডাকাতির মাধ্যমে অনির্বাচিত অবৈধ সরকারের অগণতান্ত্রিক কায়দায় প্রণীত এ বাজেটে জনগণের প্রতি কোন প্রকার দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত হয়নি। বরং ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের জন্য অন্যায্য সুবিধা প্রদানের মধ্য দিয়ে ধনিক শ্রেণী তোষণের এ বাজেট বর্তমান শোষণ-বৈষম্যের চিত্রকেই তুলে ধরেছে। নিত্য পণ্যের উপর করারোপের ফলে জনগণের উপর আবারো মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপবে। ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে সুস্পষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই। নেই শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের দুর্দশা লাঘবে কোন প্রকার ব্যবস্থা। ব্যবসায়ীদের কর ছাড়, সারচার্জ কমানোর ঘোষণা থাকলেও কৃষকদের ফসলের নায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোনো প্রকার প্রণোদনা কিংবা প্ররিকল্পনা নেই। ব্যাংকসহ আর্থিক খাত ধ্বংসের জন্য দায়ী খেলাপীঋণ আদায়ে ও টাকা পাচার বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে বরং কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে অপরাধীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। উপরন্তু বিশাল অংকের ঋণের বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না রেখে মাথাভারী প্রশাসন ও তথাকথিত মেগা প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে মেগা দুর্নীতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে এ বাজেট গণবিরোধী।

সিআইএ কবুল করছে স্ট্যালিনের রাশিয়া সম্পর্কে তাদের প্রচারগুলি ছিল মিথ্যা

'গুলাগ' শব্দটি সোভিয়েট রাশিয়া এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী প্রচার, আলোচনা ও লেখাপত্রে বহুচর্চিত। রুশ ভাষায় 'গুলাগ' শব্দটির অর্থ বন্দিদের শ্রম শিবির। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ায় ক্ষমতাসীন কমিউনিস্টরা নাকি যোশেফ স্ট্যালিনের নেতৃত্বে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের বন্দি করে এই শ্রম শিবিরে ভরে দিতেন। প্রতিদিন চলত অকথ্য নির্যাতন, যার রোমহর্ষক বিবরণ সারা বিশ্বের অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম গত ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরলসভাবে প্রচার করে আসছে। এমনকী নানা গল্প উপন্যাসের মাধ্যমেও বিশ্বাসযোগ্য সত্যের আকারে এই গুলাগের কল্পিত কাহিনি প্রচার করা হয়েছে। এ ধরনের লেখকদের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ঢালাও আর্থিক সাহায্য, রাজনৈতিক আশ্রয়, তাদের রচনার ব্যাপক প্রচার এমনকী তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিতও করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও তার মতাদর্শকে আক্রমণ করার বিশ্বব্যাপী এই পরিকল্পনায় প্রধানতম ভূমিকা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র। এহেন সিআইএ-র অতীতের সেই সব কর্মকাণ্ডের ডকুমেন্টগুলি প্রকাশ করা হয়েছে সম্প্রতি। সেইসব নথিপত্রের প্রকাশিত তথ্য সকলকে চমকে দিয়ে বলছে যে, এ পর্যন্ত গুলাগ নিয়ে যত প্রচার হয়েছে তা আসলে উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে পৃথিবীর দেশে দেশে অন্তর্ঘাত, খুন, গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া, সন্ত্রাসবাদী নানা গোষ্ঠীকে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করে বর্বর নরহত্যায় মদত দেওয়া, সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ, ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রপ্রধানদের হত্যা ইত্যাদি অসংখ্য অপকর্মে কুখ্যাত সিআইএ সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও নাক গলানোর জন্য নানা ধরনের গোয়েন্দাগিরি এবং অপকর্ম চালিয়ে গিয়েছিল ধারাবাহিকভাবে। তাদের সেই গোপন কাজকর্ম এবং অনুসন্ধানের রিপোর্ট তারা মার্কিন প্রশাসনের কর্তা তথা রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্দেশ্যে পাঠাতেন।

সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে প্রচার করা হয়েছিল যে শুধু '৩০-এর দশকে কুড়ি লক্ষ লোককে জেলে ভরা হয়েছিল এবং তাদের বেশিরভাগই রাজনৈতিক বন্দি। আর প্রকাশিত ডকুমেন্ট অনুযায়ী সোভিয়েত শাসনে কারাগারগুলিতে '৫৪ সাল পর্যন্ত মোট বন্দির সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ২২০ জন। একটি গোপন রিপোর্টে সিআইএ ওয়াশিংটনকে জানায় যে তথাকথিত এই গুলাগের ৯৫ শতাংশ কয়েদি হচ্ছে সত্যিকার ক্রিমিন্যাল। চুরি-ডাকাতি-খুন ইত্যাদির মতো অপরাধে তারা অপরাধী। তাদের কোনও রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই।

সিআইএ-র রিপোর্টই বলছে, ১৯৫৩ সালে এই সব কয়েদির ৭০ শতাংশকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই সব কয়েদীদের নিরপরাধ হিসাবে দেখান স্ট্যালিন পরবর্তী সংশোধনবাদী কর্তারা। কিন্তু মুক্তি দেওয়ার এক সপ্তাহ থেকে ৩ মাসের মধ্যেই এই সব অপরাধীদের অধিকাংশই আবার অপরাধ করে এবং সরকারের পুলিশ তাদের পুনরায় গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ কয়েদিদের রাজনৈতিক আক্রোশের বলি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যায়। যদিও সে খবর সে সময় রাশিয়াসহ বিশ্বের সংবাদমাধ্যম সম্পূর্ণ চেপে দেয়।

জেলখানায় অত্যাচার-অনাহার ইত্যাদির সম্পর্কে প্রচারের কোনও শেষ ছিল না। অথচ সিআইএ-র প্রকাশিত ডকুমেন্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দিদের শ্রমদান ব্যবস্থাটি শ্রম ও মজুরির নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হত। কয়েদিরা বেশি কাজ করলে বেশি মজুরি পেত। সিআইএ জানাচ্ছে, যে সব কয়েদি তাদের নির্ধারিত কাজের মাত্র পাঁচ শতাংশ বেশি করত, তাদের একদিনের জেলখাটাকে দুই দিন হিসেবে গণ্য করা হত।

সিআইএ তাদের রিপোর্ট-এ খাবারের জন্য মাথাপিছু যে রেশন-এর উল্লেখ করেছে, তা এমনকী তথাকথিত বনেদি পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য দেশের যে কোনও জেলের খাদ্য তালিকা থেকে অনেক উন্নত। সেই খাদ্য তালিকায় ছিল স্যুপ, ব্রেড, ভেজিটেবল এবং মাংস অথবা মাছ।

ইতালীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন ঐতিহাসিক মাইকেল প্যারেন্টি সোভিয়েত আর্কাইভ এবং সিআইএ-র তথ্য বিশ্লেষণ করে সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়েছেন যে, সোভিয়েত লেবার ক্যাম্প (শ্রম শিবির) কোনওভাবেই নাৎসিদের মতো ডেথ ক্যাম্প ছিল না। কোনও রকমের প্রণালীবদ্ধ গণনিধন ব্যবস্থা, গ্যাস চেম্বার ইত্যাদি যা নাৎসিরা গোটা ইউরোপে তৈরি করেছিল, এখানে সেরকম কোনও ব্যাপারই ছিল না। গুলাগের অধিকাংশ বাসিন্দাই তাদের মেয়াদ শেষের পর সশরীরে ছাড়া পেয়েছে। অথবা ক্ষমা প্রদর্শনের কারণে মেয়াদের আগেই মুক্তি পেয়েছে। সিআইএ-র রিপোর্টে আছে প্রতি বছরে এই ক্যাম্পগুলি থেকে ২০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ কয়েদি মুক্তি পেত। বিস্ময়কর হল, তাদেরই জানা সত্যের ঠিক বিপরীত কথা তারা তাদের বিশ্বময় নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন প্রচার করে গেছে এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে একটা দানবীয় সমাজ হিসাবে প্রচার চালিয়ে গেছে।

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের গুলাগের মৃত্যুর যে সংখ্যা দেখিয়ে তাকে অনাহারে মৃত্যু বা হত্যা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, তা যে ইচ্ছাকৃত তথ্য বিকৃতি তা মাইকেল প্যারেন্টি (সোভিয়েত আর্কাইভ ও সিআইএ-র প্রকাশিত তথ্য থেকে) দেখিয়েছেন। ১৯৩৪-১৯৫৩ পর্যন্ত এই কুড়ি বছরে যত মৃত্যু গুলাগে হয়েছিল তার অর্ধেকেরও বেশি হয়েছিল ১৯৪১-১৯৪৫ এই চার বছরে। ১৯৪৪ সালে গুলাগ ক্যাম্পে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৯২ জন। বাস্তব সত্য হচ্ছে, এই সময়কালে রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মৃত্যুর হার ছিল এরও অনেক বেশি। এই সময় গোটা দেশে ২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধে কিংবা অনাহারে। এই সময় গুরুতর অপরাধে অপরাধীদের বাদ দিয়ে ইচ্ছুক কয়েদিদের অধিকাংশকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য।

রুশ সরকার যে জেলখানার পরিবেশ উন্নতিতে আন্তরিক ছিল তার প্রমাণ আছে এই দুই নথিতেই। যুদ্ধের সময় গুলাগের মৃত্যুর হার যেখানে ছিল প্রতি হাজারে ৯২ জন, ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই তা নেমে আসে মাত্র ৩-এ। এরকম অসংখ্য তথ্য সিআইএ তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যাচারী কুৎসিত চরিত্রকে এনে দিয়েছে দিনের আলোয়।

সম্মিলিত এই মিথ্যা প্রচারের চিত্রনাট্য প্রস্তুত হয়েছিল গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে কয়েক বছর আগে। ফ্যাসিস্ট হিটলারের নেতৃত্বাধীন সামরিক শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার হাতে। জার্মানিসহ সারা ইউরোপে লক্ষ-কোটি মানুষের উপর চরম অবর্ণনীয় অত্যাচার আর বিশাল নিখুঁত পরিকল্পনায় সংগঠিত গণহত্যার, তথা আউসভিৎস, ব্রাভেন বুর্ক, মাথাউসেন ইত্যাদি অসংখ্য কুখ্যাত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প-এর লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করার হাড় হিম করা ঘটনাবলির কথা তখন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত। অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অন্যান্য সমস্ত দেশও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চরম সংকটে নিমজ্জিত। বস্তুতপক্ষে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ অনিবার্য এই সংকটই জার্মানিকে ঠেলে দিয়েছিল ফ্যাসিবাদের দিকে। অন্যদিকে চরম ক্ষয়ক্ষতি, অসংখ্য জীবনহানিসহ প্রায় ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে রণক্লান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমাজতান্ত্রিক শক্তিতে গড়ে তুলছে সমস্ত দিক থেকে উন্নত সমৃদ্ধ এক নতুন দেশ। গোটা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠেছে এক স্বপ্নের বাস্তব। পূর্ব ইউরোপে, চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশের অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের নতুন নেতা হিসেবে উঠে আসা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসররা খুব ভাল করে বুঝতে পারছিলেন, সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণের এই ক্রমবর্ধমান উৎসাহের অর্থ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মৃত্যুর পদধ্বনি। তাই যেকোনও উপায়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণের এই বিশ্বব্যাপী প্রবণতাকে ঠেকাতে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরেও তাদের বন্ধু জুটিয়ে ফেলে। এরা ক্ষমতাচ্যুত পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধি, যারা কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের নানা স্তরে আত্মগোপন করেছিল। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে দলের উনবিংশতিতম কংগ্রেসে এদের সম্পূর্ণ পরাজিত করার আহ্বান জানানোর পর অস্তিত্বের সংকটের আতঙ্ক এদের তাড়া করেছিল। মহান স্ট্যালিনের আকস্মিক মৃত্যু এদের সুযোগ করে দেয় সমস্ত কিছুকে ওলট-পালট করে দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে।

সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী তাদের কীর্তিকলাপের নথিপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর সিআইএ হয়ত তাদের পেশাদারিত্ব, বুদ্ধিমত্তা এবং দিনকে রাত করে দেওয়ার নিখুঁত পরিকল্পনার ছকে আত্মমুগ্ধ হবে। কিন্তু এই চরম মিথ্যার কোরাসে যারা গলা মিলিয়েছিলেন, অন্তত একটু লজ্জা বা অনুশোচনা কি পাওয়া যাবে তাদের আচরণে?

(ভারতের এসইউসিআই(সি) দলের বাংলা মুখপত্র সাপ্তাহিক গণদাবী : ৭১ বর্ষ ২২ সংখ্যা থেকে পুনঃমুদ্রিত)

তথ্য সূত্র :

'দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট দ্য সোভিয়েট গুলাগ সারপ্রাইজিংলি রিভিল্ড বাই দ্য সিআইএ'। (সাইদ তৈমূর অক্টোবর-০৭, ২০১৮)

ওয়েবসাইট : স্টারমিশকাটিইউশা, ডব্লিউআইএজআইটিই ডট কম

সিআইএ (ডকুমেন্ট ডিক্লাসিফায়েড। সোভিয়েট আর্কাইভাল ডকুমেন্ট)

মে দিবসের চেতনায় শ্রমিক নিপীড়নকারী ও মালিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী ফ্যাসিবাদী শাসন রুখে দাঁড়ান

"প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতায় বসেই আওয়ামী লীগ সরকার প্রথম আক্রমণ করেছে শ্রমিকদের ওপর। মালিকগোষ্ঠী ও সরকারের প্রতারণায় মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তে কমিয়ে দেয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনে গুলি চালিয়ে শ্রমিক হত্যা করা হয়েছে, সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে, ১২ হাজারের মত শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে, অসংখ্য মামলায় অজ্ঞাতনামা হাজার শ্রমিককে আসামী করে রাখা হয়েছে, আন্দোলনকারী শ্রমিকদের বিজিএমইএ তথ্যভাণ্ডারে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন করায় শ্রমিকরা হল নির্যাতিত, অন্যদিকে মালিকদের উৎস কর ও কর্পোরেট ট্যাক্স কমানোসহ নানা সুবিধা বাড়ানো হল। পাটকল শ্রমিকরা বকেয়া মজুরির দাবিতে আন্দোলন করলে তাদের ওপরও পুলিশী নির্যাতন চালানো হয়েছে। ফলে, শ্রমিকের অধিকার আদায় করতে হলে মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী এই স্বৈরাচারী সরকারের নিপীড়নমূলক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।" বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত মে দিবসের সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

সংগঠনের উদ্যোগে ১লা মে সকাল সাড়ে ১০টায় লাল পতাকাশোভিত একটি মিছিল পল্টন-গুলিস্তান এলাকায় রাজপথ প্রদক্ষিণ করে এবং পরে শিশু কল্যাণ পরিষদ চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ও বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা ফখ্রুদ্দিন কবির আতিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রমিকনেতা আ ক ম জহিরুল ইসলাম, ডা. মুজিবুল হক আরজু, রাজু আহমেদ, মামুন মিয়া, মানিক হোসেন, মো. ইউনুস, মাহবুবুল আলম, শহিদুল ইসলাম, মো. ইউসুফ প্রমুখ। সমাবেশে গণসঙ্গীত পরিবেশনা করেন দলীয় সংগঠকরা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "মে দিবস নিছক আনন্দ-উদ্‌যাপন করার দিন নয়। সকল ধরনের শোষণ-জুলুম-বৈষম্য থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য সংগ্রামের শপথ গ্রহণের দিন। শ্রমিকদের লড়াই এবং জীবনদানের বিনিময়েই মালিকেরা স্বীকার করে নিয়েছিল শ্রমিকেরাও মানুষ, তারা যন্ত্র নয়, তাদেরও বিশ্রাম-বিনোদনের অধিকার আছে। কিন্তু আজকে যেন গোটা বিশ্ব আবারও উনিশ শতকে ফিরে যাচ্ছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় এবং শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশে দেশে মালিকশ্রেণি আবারও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। লাগামহীন শোষণ ও লুটপাটের স্বার্থে তারা শ্রমিকশ্রেণির সমস্ত অধিকারকে পায়ে মাড়াচ্ছে।" তাঁরা বলেন, "বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের বর্তমান অবস্থার সাথে দেড়শ বছর পূর্বেকার অবস্থার বড় কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ শুধু শ্রমিকরা নন, যারা বহু বেতনের কর্পোরেট চাকরি করেন তারাও ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার পান না। এদেশে এখনো অধিকাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক নিয়োগপত্র, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ওভারটাইম, ছুটি, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রোডাকশন বোনাস, পেনশন কিছুই পায় না। না আছে কর্মস্থলে থাকার মতো ব্যারাক-কলোনি, না আছে চিকিৎসা সুবিধা, না পায় রেশন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বাড়িভাড়া-গাড়িভাড়া বৃদ্ধি, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির বিল বৃদ্ধি, শিক্ষা-চিকিৎসার বাড়তি খরচের চাপে সীমিত আয়ের শ্রমিক-কর্মচারীরা দিশেহারা। কর্মস্থলে শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা নেই। ২০১৪ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসে হাজারো শ্রমিক মরেছিল, কিন্তু আজও তার বিচার হয়নি, পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের আইন সরকার করেনি।" তাঁরা আরো বলেন, "শ্রমিকদের রক্ত-ঘামে আমাদের রপ্তানি বাড়ছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে, জাতীয় উৎপাদন বাড়ছে, মালিকরা টাকার পাহাড় গড়ছে, কিন্তু শ্রমিকের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।"

শেষে নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান, "ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও শ্রমিকের দুর্দশা কাটে না, অন্যদিকে মালিকরা টাকার পাহাড় গড়ে। এই অবস্থা পাল্টাতে হলে চাই শ্রমিকদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ লড়াই। তাই অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ে সংগ্রামের পাশাপাশি রাজনীতি সচেতন বিপ্লবী ধারার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।"

দিনাজপুর : মহান মে দিবস উপলক্ষে বাসদ (মার্কসবাদী) দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মিছিল সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সকাল ১১টায় দলীয় কার্যালয় হতে মিছিল শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মডার্ন মোড়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা কমিটির সদস্য মনিরুজ্জামান মনির, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন-এর জেলা সংগঠক অ্যাড. সুকুমার রায় সৌরভ, আজিজার রহমান, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা অজয় রায়।

২০ মে ঐতিহাসিক চা শ্রমিক দিবস-এর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দাবি

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২০শে মে মালনীছড়া চা বাগানে চা শ্রমিক দিবসকে রাষ্ট্রীয় দিবস ঘোষণা, ভূমির অধিকার, ৩০০ টাকা দৈনিক মজুরীর দাবীতে এক আলোচনা সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চা শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হৃদেশ মুদির সভাপতিত্বে এবং অজিত রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা সদস্য হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, বাংলাদেশ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলার সভাপতি সুশান্ত সিনহা সুমন, চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলার সদস্য সন্তোষ বাড়াইক, সন্তোষ নায়েক, লাংকাট লোহার, মালনীছড়া চা বাগানের প্রাক্তন সহসভাপতি সাধনা গেলোয়ার, বর্তমান সহ-সভাপতি জয়ন্তী গোয়ালা, খাদিম চা বাগানের ইউপি সদস্য দোলন কর্মকার, শ্রীপুর চা বাগানের শ্যামল সাওতাল, পাঞ্চাল রায়, জয়ন্ত কর্মকার, চা বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের সংগঠক অধির বাউরি প্রমুখ। এছাড়া ছড়াগাং, খান বাগানসহ বিভিন্ন বাগানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভা শেষে শত শত চা শ্রমিকের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি মালনীছড়া বাগানের মণ্ডপ থেকে শুরু হয়ে রেস্ট ক্যাম্প বাজার, লাক্কাতুরা প্রদক্ষিণ করে আবার মালনীছড়ায় গিয়ে শেষ হয়। এর পূর্বে সিলেটের বাগানে বাগানে অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ২০শে মে চা শ্রমিকদের ইতিহাসে এক রক্তস্নাত গৌরবোজ্জ্বল দিন। এতদিন ধরে মালিকরা চা শ্রমিকদের সেই ইতিহাসকে ভুলিয়ে রেখেছিল। ২০০৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এই দিনটিকে আমরা পালন করছি। দিবসটি সিলেটের ২২টি বাগানসহ সারা দেশের প্রায় সকল বাগানেই আজ নানাভাবে পালিত হচ্ছে। আগামীদিনে একে চা শ্রমিক দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে সবেতন ছুটি ঘোষণা, পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস অন্তর্ভুক্তকরণ, ৩'শ টাকা মজুরি, ৫ কেজি রেশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ ভূমি অধিকার বাস্তবায়নের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

নার্স তানিয়ার ধর্ষক-খুনিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

চলন্ত বাসে ধর্ষণের শিকার ইবনে সিনা হাসপাতালের নার্স শাহিনুর আক্তার তানিয়ার ধর্ষক ও খুনীদের ফাঁসির দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, স্বাধীনতা নার্সেস এসোসিয়েশন ও স্টুডেন্ট নার্সেস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ১৯ মে সকাল ১১টায় রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র নেত্রী আলো বেগমের সভাপতিত্বে উক্ত মানববন্ধন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী কামরুন্নাহার খানম শিখা, শাপলা রায়, স্বাধীনতা নার্সেস এসোসিয়েশন রংপুর এর সভাপতি ফোরকান আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আশরাফুল ইসলাম, সিনিয়র স্টাফ নার্স মোছা. আমিনা খাতুন, নার্সিং অফিসার সাহিদুর রহমান সাজু, স্টুডেন্ট নার্সেস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন রংপুর এর সভাপতি তারেক ইসলাম, সদস্য সালমা আক্তার প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে আইন-আদালত-প্রশাসন সবই আছে কিন্তু অপরাধীরা অপরাধ করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। গ্রেফতার হলে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জামিন পায়। আর অন্যায়ের শিকার, খুন-ধর্ষণের শিকার নারী-শিশুর পরিবার দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে বিচারের আশায়। ন্যায্য বিচার পাওয়ার জন্য এদেশে আন্দোলন করতে হয়। নতুবা অপরাধীর বিচার হয় না। নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্র এবং প্রশাসনের কাছে দাবি জানান নার্স তানিয়া, মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতসহ সকল নারী ও শিশু নির্যাতন-খুন-ধর্ষণের বিচারে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে গৃহকর্মীদের স্মারকলিপি পেশ

গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, সরকারীভাবে ন্যূনতম মজুরী ঘোষণা, কাজে যোগদানের আগে নিয়োগপত্র দেয়ার দাবীসহ ৯ দফা দাবীতে 'গৃহকর্মী অধিকার রক্ষা কমিটি' চট্টগ্রাম জেলার পক্ষ থেকে ২ মে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এর পূর্বে সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে কমিটির সভাপতি আসমা আক্তারের সভাপতিত্বে এবং সহ-সম্পাদক ওপিয়া আক্তারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি বেবী বেগম, সহ-সভাপতি রিনা বেগম, সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুয়ারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজা বেগম, আজেনা বেগম, শিরিনা বেগম প্রমুখ গৃহকর্মী নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বাসা-বাড়ীতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে প্রায় ৫০ লাখ নারী, কিশোরী, শিশু। কিন্তু এরা সকলে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক। সমাজ থেকে দাসব্যবস্থার উচ্ছেদ হলেও গৃহকর্মীদের দাস হিসাবে দেখার মানসিকতা এখনো দূর হয়নি। গৃহকর্মীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করলেও তার প্রাপ্য মূল্য বা স্বীকৃতি পায় না। বাসা-বাড়ি, মেস, হোটেল, অফিস-আদালতে কিংবা বিভিন্ন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে তারা রান্না, তরকারি কাটা, মসলা বাটা, ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া, প্রসূতি মায়ের নানা কাজ করা, বাসার আসবাবপত্র পরিষ্কার করা ইত্যাদি নানান কষ্টসাধ্য কাজ করে। কিন্তু সরকারিভাবে কোনো নীতিমালা বা আইন না থাকার কারণে শ্রমিক হিসাবে এখনো তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ন্যায্য মজুরি তো অনেক পরের কথা, নেই বাঁচার মতো মজুরী ও সাপ্তাহিক ছুটি। তাছাড়া নানাভাবে যৌননিপীড়নের ঘটনার খবরও আমরা জানি। ধর্ষণ, খুন, শারীরিকভাবে নানা নির্মম নির্যাতন, চুরির মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি তো আছেই। বাংলাদেশে নিয়োজিত গৃহকর্মীদের প্রায় ৮৫ ভাগ শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু সেগুলোর কোনো বিচার হয় না। অথচ আমরা জানি, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসহায় নারীরা বাবা-মায়ের ভরণ-পোষণ, সন্তানের পেটের ভাত, পড়ালেখার খরচ, চিকিৎসার খরচ, মাতাল স্বামীর ভরণ-পোষণের জন্য ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বড় বড় শহরগুলিতে আসছে মানুষের বাসা-বাড়িতে কাজ করতে। সবচেয়ে কম টাকা খরচ হয় শহরের এমন জায়গায় তারা থাকে। সেখানে মাথা গোঁজার যে জায়গাটুকু তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা দিয়ে ভাড়া নেয়, তাতে নেই বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশনের ব্যবস্থা। আগুন লাগলে তাতে পুড়ে মরতে হবে, এমন ঘিঞ্জি পরিবেশে তারা থাকে। মদ-গাঁজা সহ বিভিন্ন নেশাদ্রব্য সহজেই পাওয়া যায় যা তাদের স্বামী-সন্তানদের বিপথগামী করছে।

বক্তারা আরো বলেন, আইএলও কর্তৃক ১৯৯৬ সালে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে যেসব অধিকার কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে তা হল : ক) গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের পছন্দ মতো কোনো সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা কোনো সংস্থায় যোগদান এবং এই ধরনের সংস্থার কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের অধিকার; খ) চাকুরি বা পেশার বৈষম্য থেকে রক্ষার অধিকার; গ) কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অধিকার; ঘ) পারিশ্রমিক পাবার অধিকার; ঙ) সংবিধিবদ্ধ সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার অধিকার; চ) প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার; ছ) কর্মে বা চাকুরিতে প্রবেশের নিম্নতম বয়স সীমা; জ) মাতৃত্ব রক্ষার অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশে গৃহকর্মীরা আইএলও স্বীকৃত সব অধিকার থেকেই বঞ্চিত। এ পরিস্থিতে আমরা মানুষের মতো মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাই। উত্থাপিত ৯ দফা দাবি আদায়ে গৃহকর্মীরা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, ভবিষ্যতে এ দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে ।

সমাবেশ শেষে শহীদ মিনার থেকে একটি মিছিল নিউমার্কেট, কোতোয়ালী প্রদক্ষিণ করে কোর্ট বিল্ডিংস্থ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদানের পর সমাবেশের কাজ শেষ হয়।

ভূমি অফিসের দুর্নীতি-হয়রানির প্রতিবাদে ধুনটে বিক্ষোভ

বগুড়ার শেরপুর ধুনট উপজেলায় 'ভূমি রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর উদ্যোগে দুর্নীতিবাজ-ঘুষখোর সাবেক সেটেলমেন্ট অফিসার আরিফুর রহমান ও এসও মনতাজ আলীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, অবিলম্বে সকল জমির ভুয়া রেকর্ড সংশোধন করা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও হয়রানি বন্ধ করা এবং সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দাবীতে গত ২ মে ধুনট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে ভূমিমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়

স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে ভূমি রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের উপদেষ্টা ও বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা রঞ্জন কুমার দে'র সভাপতিত্বে স্থানীয় শহীদ মিনারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আহসানুল হাবীব সাইদ, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আকবর হোসেন, বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সদস্য ইসমাইল হোসেন, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয়নাল আবেদীন মুকুল, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাহা সন্তোষ, বাংলাদেশ কৃষক ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিয়াকত আলী, সাইফুল ইসলাম পল্টু, আমিনুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান।

নুসরাত হত্যার বিচারের দাবিতে বাম জোটের ঢাকা-সোনাগাজী রোডমার্চ অনুষ্ঠিত

নুসরাত হত্যার বিচার দাবিতে ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধের ডাকে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ২ মে ঢাকা থেকে সোনাগাজীর উদ্দেশ্যে রোডমার্চ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে সাতটায় মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সমাবেশে বাম জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাসদ নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাম জোটের কেন্দ্রীয় নেতা সিপিবি সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, সিপিবি সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা আ ক ম জহিরুল ইসলাম, কমিউনিস্ট লীগ নেতা নজরুল ইসলাম, গণসংহতি আন্দোলনের নেতা বাচ্চু ভাইয়া, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হামিদুল হক, নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শম্পা বসু, সিপিবি নারী সেলের লুনা নুর, মুনিরা বেগম অনু, অ্যাডভোকেট ফরিদুন্নাহার লাইলী, ডক্টরস ফর হেলথ অ্যাণ্ড এনভাইরনমেন্ট এর অধ্যাপক ডা. ফজলুর রহমান প্রমুখ।

উদ্বোধনের পর ২টি মাইক্রোবাস ও ১টি বাসযোগে নেতা-কর্মীরা রোডমার্চ যাত্রা শুরু করে সকাল সাড়ে ৮টায় কাঁচপুরে, সকাল সাড়ে ৯টায় সোনারগাও মোগড়াপাড়া চৌরাস্তায়, সকাল সাড়ে ১১টায় কুমিল্লার চান্দিনায়, দুপুর ১২টায় কুমিল্লা পদুয়ার বাজারে পথ সভায় মিলিত হয়। দুপুর দেড়টায় রোডমার্চ বহর ফেনী মহিপালে পৌছায়। সেখানে দুপুরের খাবার গ্রহণ শেষে যাত্রা করে বিকেল সাড়ে তিনটায় সোনাগাজী পৌছায়। সোনাগাজীতে নেতৃবৃন্দ নুসরাতের বাড়ী গিয়ে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সান্ত্বনা দেন, সহানুভূতি জানিয়ে নুসরাত হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে বাম জোটের নেতা-কর্মীরা শেষ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। পরে সোনাগাজী শহীদ মিনারে সমাবেশে মিলিত হন। ফেরার পথে ফেনী শহীদ মিনারে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ফেনীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন। অ্যাড. মিল্কী, ডা. হারাধন চক্রবর্ত্তী, জসিম উদ্দিন, অ্যাড. সাগর, রাসেল প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নুসরাতসহ ভয়ঙ্কর যতো ঘটনা ঘটেছে সবই শাসক দলের নেতা-কর্মীদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে। নেতৃবৃন্দ বলেন পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থায় নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা, ধর্মীয় কুসংস্কার, ফতোয়া-নাটক-সিনেমা-বিজ্ঞাপনে নারীদেহকে পণ্য হিসেবে তুলে ধরা, পর্নোগ্রাফির প্রসারের কারণেই সারা দেশে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার হচ্ছে নারী-শিশুরা। এছাড়াও বিচারহীনতার যে রেওয়াজ তৈরি হয়েছে, সেটাই ধর্ষকদের নারী-শিশু নির্যাতনে উৎসাহী করছে। নেতৃবৃন্দ সারাদেশে নারী শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে ২৫ ভাগ বরাদ্দের দাবিতে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ

শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ২৫ ভাগ বরাদ্দসহ সিলেটের শিক্ষা সংকট নিয়ে ৮ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখা। ২১ মে সকাল ১১ টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট নগর শাখার সভাপতি সঞ্জয় কান্ত দাশের সভাপতিত্ব ও সাধারণ সম্পাদক সাদিয়া নোশিন তাসনিমের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন নগর শাখার সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ চন্দ্র শীল, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিম আহমদ চৌধুরী, মদন মোহন কলেজ শাখার সংগঠক পলাশ কান্ত দাশ, এমসি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক আকরাম হোসেন প্রমুখ।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংবিধান ও পার্লামেন্ট, যেগুলিকে আমরা দেখি সেগুলি চিরকাল ছিল না, চিরকাল থাকবেও না। ইতিহাস ও সমাজপ্রগতির ধারায় একটি বিশেষ স্তরে বিশেষ অর্থনৈতিক বনিয়াদের রাজনৈতিক উপরিকাঠামো হিসেবে, শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদটির রক্ষক হিসেবে এদের আবির্ভাব ঘটেছে।

ইতিহাসের অগ্রগতির পথে বুর্জোয়ারা একদিন শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হয়ে, পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙ্গে পত্তন করল নতুন পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিল্পবিপ্লব ঘটাল। পুরাতন সামন্তী অর্থনীতির বদলে নূতন পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়ম চালু করল, যে নূতন নিয়মের প্রথম অবস্থায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবাধ ও সুষম প্রতিযোগিতার নীতিটি স্বীকৃত হল। এই যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সকলেরই অবাধ ও সমানাধিকারের নীতিটি স্বীকৃত হল – এরই পরিপূরক হিসেবে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা, আইন-ব্যবস্থাতেও মানুষের সমানাধিকার ও অবাধ স্বাধীনতার নীতিটিকে স্বীকৃতি দেয় এমনই এক ... রাজনৈতিক উপরিকাঠামো তৈরীর সামাজিক প্রয়োজনটি দেখা দিল।

অতীত ইতিহাসের এই বিশেষ সন্ধিক্ষণে ... সেদিন শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়ারা ছিল সমাজের সবচেয়ে অগ্রগামী অংশ। সামন্তী সমাজের অভ্যন্তরে শোষিত অত্যাচারিত মানুষের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সমানাধিকারের পতাকা এরাই সেদিন বহন করেছে। এরাই সেদিন পুরাতন সামন্তী সমাজকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক সামাজিক সমর্থনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ধ্বনি তুলেছিল : "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা"। ... আর, পুরাতন সামন্তী অর্থনৈতিক বনিয়াদকে ভাঙ্গার প্রয়োজনে দেখা দিল এরই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যতকিছু গলিত, জীর্ণ সামন্তী চিন্তা-ভাবনা, আচার অভ্যাস, নীতি-নৈতিকতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিচার, আইন, আর সবার উপরে রাজতন্ত্র আর তার দৈব অধিকারের ধারণাকে উপড়ে ফেলার সংগ্রাম।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই প্রভাতে, বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা বলেছেন : "যদি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একজন ব্যক্তিও অন্য সকলের সঙ্গে চিন্তায় একমত না হতে পারেন, তবে সেই একজনের চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ঠিক তেমনই থাকে, যেমন সেই একজনেরও কোন অধিকার নেই তার একার চিন্তা ও মতকে চাপিয়ে দিয়ে বাকী সকলের কণ্ঠ রোধ করার। বিরুদ্ধ মতের কণ্ঠরোধের অর্থ হলো যারা এই কণ্ঠরোধ করেন, তাদের এক অদ্ভুত অহংবোধ যে তারা কখনই ভুল করতে পারেন না।" ... (লিবার্টি – জন ষ্টুয়ার্ট মিল)।

সেদিন বুজোয়ারা সংগ্রাম করেছিল – যে কোন মত পোষণ ও তার অবাধ প্রচার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য। "স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি অর্জনের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম পরিচালনার স্বাধীনতা তারা দাবী করেছিলেন। বিনা বিচারে অন্তরীণ রাখা ও নির্যাতন চালানো, যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ব্যতিরেকে বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ ও তল্লাসী চালানো – এইসব স্বৈরাচারী অনাচারের অবসান ঘটানোর জন্য সংগ্রাম একদিন এই বুর্জোয়ারা করেছিলেন। ... মত ও আদর্শ পোষণ করা ও তার প্রচারের স্বাধীনতাকে কোন শর্তেই যে সমর্পণ করা যায় না – একথাও একদিন এই বুর্জোয়ারা বলেছিলেন।"

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে। সেটা হল এই যে, বুর্জোয়ারা সাম্য- মৈত্রী-স্বাধীনতার উদাত্ত ধ্বনি তুলল। এই যে তারা বলল যে, সমাজের সকল মানুষের সমান অধিকার – এইসবের কি মানে থাকতে পারে, যদি না মানুষ সমাজে সত্যিকারের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। যদি না মানুষের উপর মানুষের শোষণ চালাবার তথাকথিত অধিকার থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারে। যদি একটা পুঁজিপতি মালিকের তথাকথিত 'স্বাধীনতার' দাবী মেটাতে শতসহস্র মানুষের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই জীবনের অবসান ঘটে। আর, ঠিক এই জিনিসটিই সমাজে নিয়ে এল বুর্জোয়া শাসক।

বুর্জোয়াদের শ্রেণীশোষণের ভিত্তিতে যে নুতন সমাজব্যবস্থাটিকে তারা গড়ে তুলল পুরাতন সামন্তী সমাজকে ভেঙ্গে, সেই নতুন ব্যবস্থায় সমাজের উৎপাদনের যন্ত্রের মালিকানাটি হস্তগত করল। ... পুঁজিপতিশ্রেণীর মালিকানার এই যে তথাকথিত 'স্বত্ব'টি প্রতিষ্ঠিত হল, তারই যুপকাষ্ঠে বলি হল সমাজের মুক্তি, মানুষের মুক্তি। আর সেই জন্যই বুর্জোয়াদের এই যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা সফল করতে সমাজের সাধারণ মানুষের এত বলিদান, এত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, তার মধ্য দিয়ে এল না এই অর্থনৈতিক শোষণের অবসান – ... বদল হল মালিকানার, এক শ্রেণীর হাত থেকে আর এক শ্রেণীর হাতে।

তাই সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমান অধিকারের যে উদাত্ত ধ্বনি, বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসবার আগে একদিন তুলেছিল, তা হল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে পর্যবসিত। কেননা, অর্থনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলে জীবনভোর আবদ্ধ মানুষের কাছে, বুর্জোয়াদের প্রতিশ্রুত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীটি রয়ে থাকল শুধু কথার কথা – অত্যাচার আর অবিচারের পাষাণভার থেকে মুক্তির জন্য আইন ও ন্যায্য বিচারের ধারণা লেখা রইল পুঁথির পাতায় – জীবনে তা কার্যকরী হল না।

কিন্তু এই সহজ সরল সত্য কথাগুলো যখন আমরা মনে রাখব, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে এ ভুলও করব না যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর যে সমাজটা পুরাতন সামন্তী সমাজকে ভেঙ্গেই গড়ে উঠল, তা চিন্তা-চেতনা অধিকারের বিচারে পুরাতন সামন্তী সমাজ থেকে কোন ছেদই ঘটাতে পারেনি। না, তা নয় – ছেদ নিশ্চয়ই ঘটলো। বুর্জোয়ারা সামাজিক দাবী হিসাবে ... গণতন্ত্রের যে ধারণা এবং মানুষের অধিকারগুলি মেনে নিতে বাধ্য হল, তা ছিল পুরাতন সামন্তী সমাজে, এক কথায় অকল্পনীয়। তাই সামন্তী সমাজে যা সম্ভব হয়নি, বুর্জোয়া সমাজে, সাধারণভাবে ভাবতে গেলে, সেই 'আইনের শাসন', 'আইনের চক্ষে সবাই সমান' অন্ততঃপক্ষে কার্যকরী নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ...

... বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থায় গোড়ার যুগে যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং তাতে সকলের সমান অধিকারের নীতিটি কার্যকরী ছিল, এরই পরিপূরক হিসাবে রাজনৈতিক উপরিকাঠামো হিসাবে গড়ে উঠেছিল বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র। এরও ভিত্তি ছিল, সামন্তী সমাজের রাজতন্ত্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারের বদলে, ব্যক্তির মত ও আদর্শ পোষণ ও তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে নির্বাচন বা সমাজের মানুষের স্বাধীন ও অবাধ অভিমতের ভিত্তিতে প্রশাসন ক্ষমতা পরিচালনের নিরঙ্কুশ অধিকার। বুর্জোয়া সাংবিধানিক প্রতিনিধিত্বমুলক গণতন্ত্রের এই ছিল ভিত্তিমূল। ...

... ইতিহাসের ধারা বেয়ে, অবাধ প্রতিযোগিতার স্তর অতিক্রম করে পুঁজিবাদ, বিকাশের এক বিশেষ স্তরে একচেটিয়া পুঁজি ও লগ্নীপুঁজির জন্ম দিল, যার অপর নাম সাম্রাজ্যবাদ। পুঁজিবাদ পরিবর্তিত হয়ে গেল একচেটিয়া পুঁজিবাদ, যৌবন হল জরা। ... বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বর্তমান সর্বাত্মক সংকটের পরিস্থিতিতে, উন্নত-অনুন্নত সকল পুঁজিবাদী দেশেই ব্যক্তিগত একচেটিয়া পুঁজির সাথে রাষ্ট্রীয় পুঁজির মিলন ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টি হয়েছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা, একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাসে পর্যবসিত হয়েছে। আর এই যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টি হয়েছে, এটাই হচ্ছে ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিমূল।

সুতরাং একচেটিয়া পুঁজির আবির্ভাবের আগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার বনিয়াদের উপরিকাঠামো হিসাবে যে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো গড়ে উঠেছিল – তার রূপ ও চরিত্র, নূতন পরিস্থিতিতে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদাকে যে মেটাতে আর পারে না, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, এটাই স্বাভাবিক। কাজেই একদিন এই বুর্জোয়া প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ঘিরে যে ঐতিহ্য ও গৌরবচ্ছটা গড়ে উঠেছিল, একচেটিয়া পুঁজির এই স্তরে, সেই বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেই তার অবলুপ্তি ঘটতে থাকল ...। তাই, হয় বুর্জোয়া পার্লামেন্ট ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে সোজাসুজি ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হল, না হয় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ঠাঁট বজায় রেখে, সেই একই ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম হল।

আজকের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমগ্র বুর্জোয়া দুনিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে হাজির হয়েছে ফ্যাসিবাদ। ... বিশ্বজোড়া সংকটের ধাক্কায় নেহাৎ অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদেই, কি আপেক্ষিক অর্থে উন্নত বা অনুন্নত, সব পুঁজিবাদী দেশের রাজনীতিতেই ফ্যাসিবাদের প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বর্তমান একচেটিয়া পুঁজির স্তরে, সংকটে জর্জরিত পুঁজিপতিশ্রেণী, অতীত দিনের অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আইনের শাসনকে কার্যকরী করতে যে আগ্রহ-উৎসাহ দেখাত আজ আর তা দেখায় না। প্রাক্ একচেটিয়া পুঁজির যুগে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রনীতিবিদরা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকারের সুরে সুর মিলিয়ে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, বিচার ব্যবস্থার অপক্ষপাত, আপেক্ষিক স্বাধীনতার দাবী যেমন তুলে ধরতেন, সেই সঙ্গে ঐগুলির মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার যাতে প্রসার ঘটে, তার জন্য লড়তেন। কিন্তু পুঁজিবাদ যখন থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদের রূপ পরিগ্রহ করল, তখন থেকেই প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার নীতিকে বিসর্জন দিয়ে প্রশাসনব্যবস্থাকে করা হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিরঙ্কুশ স্বার্থরক্ষার একটি যন্ত্র বিশেষ। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কেও একথা একইভাবে সত্য। এরই ফলে সমাজের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা ক্রমশঃই বেশী বেশী করে খর্ব হচ্ছে।

যে বুর্জোয়ারা একদিন ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারের অনুরক্ত, তারাই আজ হয়েছে বিভিন্ন বুর্জোয়া দেশে দেশে আমলাতান্ত্রিক কঠোরতা আর জঙ্গীবাদের ভক্ত। ... এ যুগের অগ্রণী মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষায় – "কি উন্নত, কি অনুন্নত, সকল পুঁজিবাদী দেশেই, বিশেষতঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ফ্যাসীবাদ নানারুপে, নানা প্রকারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।" শুধু তাই নয় – "এমনকি যেসব বুর্জোয়া দেশে পার্লামেন্টের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, সেখানেও বুর্জোয়া সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকার, সুযোগ সুবিধাগুলিও ক্রমাগত খর্ব করা হচ্ছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছেও বুর্জোয়া পার্লামেন্টের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।" ... ...

... অথচ এমনই মজা, বিভিন্ন বুর্জোয়া দেশগুলিতে আজও দেখা যাবে বুর্জোয়া দলগুলি ... একে অপরের দোষারোপ করছে তারস্বরে। একে অপরকে বলছে অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিষ্ট। কোথাও আবার বুর্জোয়াদের যে অংশ ... বিরোধী দল হিসাবে কাজ করছে, তারা গদীয়ান অংশকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ক্ষমতাসীন দলের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ, ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণের নাম নিয়েই, তাদের স্বার্থের ধ্বজা তুলেই, আন্দোলন-লড়ালড়ির ভাব দেখাচ্ছে। ... একবার গদীতে বসলে এরা সবাই এক – সেই একই বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা – জনতার স্বার্থের জলাঞ্জলি। সেই একই শোষণ-দারিদ্র-অনাহারের চাবুক থেকে গরীবের রক্ত ঝরবে। শুধু তাই নয়, গদীয়ান দলের ক্ষমতার ব্যভিচার সম্পর্কে এত যে অভিযোগ, গদীতে বসলে এঁরা কিন্তু সেটা ছাড়তে চাইবেন না। বিপক্ষ দল যা রেখে গেল, ক্ষমতার ব্যভিচারের জের সমানেই এঁদের হাত দিয়েও বইতে থাকবে। ... ...

... এই ফ্যাসিষ্টরা ক্ষমতা করায়ত্ত করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেও সাধারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি খর্ব করে। কেননা, এর দ্বারাই তারা সংকটে জর্জর পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের অর্থনৈতিক অধিকারটি জনগণের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে রাখতে চায়। ...

... ... বিংশ শতাব্দীতে, ইতালী ও জার্মানীতে সামরিকভাবে পর্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও ফ্যাসীবাদ আজকের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ... রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে গণতন্ত্রের অস্বীকৃতি, জনতার গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকারগুলি খর্ব করা এবং অপরদিকে শাসনযন্ত্রের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাজনৈতিক শক্তিকে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করার মধ্য দিয়ে এই ফ্যাসীবাদী লক্ষণগুলি প্রকাশিত হচ্ছে। সাথে সাথে এই সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে বিচারবিভাগের অধিকারকেও খর্ব করা হচ্ছে এবং সংসদীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রে একজন ব্যক্তি বা দেশ শাসনের দায়িত্বে ন্যস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন অঙ্গ কতৃক 'আইনী শাসন' লঙ্ঘন করার সম্ভাব্য কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ... বিচারবিভাগ এতদিন পর্যন্ত যে অধিকার ভোগ করে এসেছে – তার সেই ঐতিহ্যগত অধিকারকেও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং এইভাবে বিচারবিভাগকে কার্যতঃ সরকারী প্রশাসনের অধীনস্ত একটি ক্ষমতাহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হচ্ছে। ...

পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অধুনা যে সকল প্রচেষ্টা বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে, তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হল, সর্বপ্রধান প্রশাসক তা তিনি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি যিনিই হোন না কেন, তার হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা। ... প্রধান প্রশাসক সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত, নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতার অধিকারী হবার ফলে, স্বাভাবিক কারণেই ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রে বুর্জোয়া সংবিধানের বিভিন্ন যন্ত্রের পারস্পরিক ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটে। প্রশাসন যন্ত্রই সাংবিধানিক সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়। নতুন ব্যবস্থায়, মন্ত্রীসভাসহ প্রশাসন, আইন সংসদ বা পার্লামেন্টের পরিবর্তে, প্রধান প্রশাসকের কাছে দায়ী থাকে এবং তারই ইচ্ছানুযায়ী প্রশাসন কার্য্য নির্বাহ করে থাকে।

এ থেকে কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে ফ্যাসিবাদে বুর্জোয়ারা ... এখন আইনী শাসনের স্থলে ব্যক্তি শাসনের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কেউ যেন মূহুর্ত মাত্রের জন্য এ ভুল না করেন যে ফ্যাসিবাদের *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) এই প্রধান প্রশাসক ব্যক্তিটি কিন্তু অতীতের সামন্ততন্ত্রের কোন রাজা বা সম্রাট নন। তিনি হচ্ছেন একজন ফ্যাসিষ্ট একনায়ক – বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা – যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়া সংবিধান ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে সঙ্কটজর্জরিত বুর্জোয়া অর্থনীতি ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। ...

আজকের যুগের বুর্জোয়ারা আরও চতুর। 'গণতন্ত্রের সাইনবোর্ড'কে উজ্জ্বল রেখে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তারা পার্লামেন্টকে চালু রাখে ; অবশ্য তার পূর্বের ক্ষমতা ও মর্যাদা কেড়ে নিয়ে – এবং তাকে প্রধান প্রশাসকের কর্তৃত্বাধীন প্রশাসনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের আওতার মধ্যে এক ক্ষমতাবিহীন 'আলাপ-আলোচনা করার সংস্থা' মাত্রে পরিণত করে। ...

... ... মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে বিষয়টি খুবই পরিষ্কার। তাঁরা যেমন বুর্জোয়া সংবিধান ও রাষ্ট্রকাঠামোর সীমাবদ্ধতার বিষয়ে জনগণকে যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন, তেমনি এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যেখানে যতটুকু আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার ধারণাটুকু কাজ করছে, তাকে আরও সংকুচিত করার অপচেষ্টাকে তাঁরা কোনমতেই সমর্থন জানাতে পারেন না। এবং তাকে রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য তারা লড়েন। তাঁরা জানেন, এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার খন্ডিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিঃশেষিত হবার পথ বেয়েই এর সঙ্গে ছেদ টেনে স্বাধীনতা ও অধিকারের পূর্ণতা অর্জনের সংগ্রাম উন্নততর সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটাবে। তাই দেশের অভ্যন্তরে যাঁরাই ফ্যাসিবাদকে শিকড় চালাতে বাধা দিতে এগিয়ে আসবেন, তাঁরাই দেখবেন যে প্রকৃত সাম্যবাদীরা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়ছেন। ...

[ভারতের 'সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইণ্ডিয়া (কমিউনিস্ট)' বা এসইউসিআই(সি) পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে' পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত।]

সরকার নির্ধারিত দামে ধান ক্রয়ের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) **সিলেট :** হাটে হাটে ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরকারি উদ্যোগে খোদ কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় ও ধানের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে বিকাল ৩টায় সিলেটে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলার সদস্য রেজাউর রহমান রানার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের সিলেট জেলার সদস্য মহিতোষ দেব মলয়, রুবাইয়াৎ আহমেদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সভাপতি সঞ্জয় কান্ত দাশ প্রমুখ।

দিনাজপুর : ধানের লাভজনক দাম নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ১৯ মে ২০১৯ সকাল ১১টায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আলতাফ হোসাইন, ইউসিএলবি দিনাজপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার আলী সরকার, বাসদ (মার্কসবাদী)-র এ এস এম মনিরুজ্জামান মনির, বাসদের কিবরিয়া হোসাইন।

বাম জোট : ধানের লাভজনক দাম নিশ্চিত করে কৃষক বাঁচানো ও অবিলম্বে পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধসহ ৯ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯ মে সকাল সাড়ে এগারোটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম জোটের কেন্দ্রীয় নেতা বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, সিপিবি সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশাররফ হোসেন নান্নু, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা আ ক ম জহিরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের নেতা জুলহাসনাইন বাবু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির নেতা লিয়াকত আলী।

ধানের ন্যায্য মূল্য নেই

বাম্পার ফলনেও বাম্পার কষ্ট কৃষকের

(১ম পৃষ্ঠার পর) উদ্যোগ নেই। নামকাওয়াস্তে ধানের ক্রয়মূল্য ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ সরকারের উদ্যোগ। এবছর সরকার ধান সংগ্রহের সরকারি ক্রয়মূল্য ঘোষণা করেছে ১০৪০ টাকা। এই দামে সরকার ধান ক্রয় করবে দেড় লাখ টন মাত্র অর্থাৎ উৎপাদিত ধানের ১ শতাংশ মাত্র। তবু এইটুকু সুফলও কৃষক পাবে না। সরকারের ধান সংগ্রহের যে পদ্ধতি তাতে মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া ও চালকল মালিকরাই এতে লাভবান হবে। কারণ সরকারি সংগ্রহের বেশিরভাগটাই চাল–আর চাল মিল মালিকদের থেকেই কেনা হয়। ধান ক্রয়ের ক্ষেত্রেও সরকারি দলের স্থানীয় লোকজনেরই আধিপত্য থাকে। উপরন্তু নিয়ম করা হয়েছে ১৪ শতাংশের বেশি আর্দ্রতা থাকলে সেই ধান গুদামে কেনা হবে না। আমাদের দেশের বাস্তবতায় একজন কৃষক জানেই না আর্দ্রতা কী? সে কীভাবে সরকারের এই নিয়ম রক্ষা করে ধান বিক্রি করবে? ধান সংরক্ষণেরও পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। এই সমস্ত বিড়ম্বনা এবং পাওনাদারের চাপে কৃষক দ্রুত ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আর মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরা কৃষকের কাছ থেকে প্রায় কম দামে ধান কিনে প্রায় দ্বিগুণ দামে সরকারের কাছে বিক্রি করে। ফলে এই প্রক্রিয়া কৃষকদের সুরক্ষা দেয়া সম্ভব নয়।

আমাদের পাশ্ববর্তী দেশের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রতিবছর প্রায় ৫০ লাখ টন ধান ক্রয় করে। এবং তা খোদ কৃষকের কাছ থেকে। আর্দ্রতা পরীক্ষার মতো নিয়ম সেখানে নেই। সরকার 'সেলফ হেলপ স্কেপ' নামে কিছু গ্রুপ তৈরি করে। যারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ধান কিনে জেলা খাদ্য কর্মকর্তাকে জানায়। সেই ধান সরকারই শুকানোর ব্যবস্থা করে। বেসরকারি গুদাম ভাড়া নিয়ে সেখানে ধান সংরক্ষণ করে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকার কৃষকদের সুরক্ষায় ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি নগদ সহায়তা বা কৃষিতে বিপুল ভর্তুকি দেয়। আমাদের দেশে সরকার মুখে কৃষকবান্ধব বলে বলে গলা ফাটালেও কৃষিখাতে প্রতিবছর বরাদ্দ হ্রাস করছে। ফলে বীজ, সার, কীটনাশকের দাম বাড়ছে। সর্বোপরি কৃষকের হাতে নগদ অর্থ না থাকায় যে ঋণ নিয়ে কৃষকরা ফসল ফলাবে সেই ঋণও মেলে না। খাদ্যনীতি পরামর্শ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইফপ্রি)-র তথ্যমতে, দেশের কৃষকরা মাত্র ৬ শতাংশ ঋণ পায় সরকারি কৃষি ব্যাংক থেকে। আর বেসরকারি উৎস থেকে ঋণ নেয় ৮১ শতাংশ। যার সুদের হার ১৯ থেকে ৬৩ শতাংশ পর্যন্ত। ফলে উচ্চ সুদের ঋণ, সার, বীজ, কীটনাশকের বর্ধিত দামের কারণে ধানের উৎপাদন খরচও বেশি। প্রতিবেশি ভারতে এক কেজি ধানের উৎপাদন খরচ ১৮ টাকা ৭৫ পয়সা। থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া বা ভিয়েতনামেও ২০ টাকার কম। আর বাংলাদেশে এক কেজি ধানের উৎপাদন খরচ ২৫ টাকা। এই উৎপাদন খরচ কমাতে না পারলে কৃষকদের লোকসান থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর উৎপাদন খরচ কমাতে হলে কৃষিখাতে বরাদ্দ বৃদ্দি ও সরাসরি ভর্তুকি, অল্প সুদে ছোট ও মাঝারি কৃষকদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনো প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কৃষি পেশার সাথে যুক্ত। কৃষিই জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। ফলে কৃষি ও কৃষক বিপর্যস্ত হলে গোটা অর্থনীতিই বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। তবু সরকারের টনক নড়ছে না। অল্পসুদে সরকার কৃষকদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে পারে না অথচ এক ব্যাংকিং খাতেই খেলাপি ঋণের পরিমাণ দেড় লাখ কোটি টাকার বেশি। কৃষি ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত না করলেও কৃষি পণ্য রপ্তানিকারী ব্যবসায়ীদের জন্য ২০ শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে, পোশাক শিল্প মালিকদের জন্য প্রণোদনা দিচ্ছে ২ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা, ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর ছাড় দেয়া হচ্ছে কিন্তু কৃষকদের উন্নয়নের জন্য কোন বরাদ্দ নেই। তাই সরকার যে উন্নয়নের কথা বলছে, বুঝতে হবে সে উন্নয়ন এদেশের সাধারণ মানুষদের তথা কৃষকদের উন্নয়ন নয়, বড় বড় ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের উন্নয়ন।

সরকারি ব্যয়হ্রাসের প্রতিবাদে আন্দোলনে উত্তাল ব্রাজিল

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ছাত্র, অধ্যাপক, গবেষক, বিজ্ঞানী, কর্মচারী, শ্রমিক,অভিভাবকরা বিক্ষোভে অংশ নেয়। সমস্ত বিশ্বদ্যালয় ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়ে। শুধু সাওপ্রাওলো শহরেই ৩ লক্ষ বিক্ষোভকারী বিক্ষোভে অংশ নেয়। রিওডিজেনেরিওতে প্রায় ১ লক্ষ বিক্ষোভকারী মিছিল ও প্রতিবাদে অংশ নেয়। 'শিক্ষা কোন পণ্য নয়'–শ্লোগানে, "Class today is in the street", "Either stop the cuts or we stop Brazil", ÒBooks yes, weapons no"– ব্যানারে পুরো ব্রাজিল উত্তাল হয়ে ওঠে। সাওপ্রাওলো শহরের বিক্ষোভে অংশ নেয়া এক ছাত্রী ডেনিয়া ক্রিস্টিনা বলেন, "এদেশে মিলিটারির জন্য সরকারের টাকার অভাব হয় না, টাকার অভাব হয় শিক্ষার জন্য। আমাদের দেখানো প্রয়োজন, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের গুরুত্ব আছে। জনগণ শিক্ষার অধিকার রক্ষার জন্য লড়বে।" আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছাত্রনেতা জেসিডায়ান বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ হ্রাসের সিদ্ধান্ত বাতিল করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাস্তা ছাড়বো না। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রসমাজ জনগণের শিক্ষার অধিকার রক্ষার দায়িত্ব প্রালন করেছে, আজও আমরা শিক্ষার অধিকার রক্ষা করবোই! কারণ আমাদের দেশের উন্নয়ন ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাসে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।" ব্রাজিলের ছাত্রসমাজ পেনশন সংস্কার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনেও সমর্থন জানায়। ১৫ ও ৩১ মে'র সফল ধর্মঘটের ধারাবাহিকতায় ব্রাজিলের ১২টি বড় শ্রমিক সংগঠন, ছাত্রসংগঠনসমূহ, শিক্ষক, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের সংগঠনসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক ও আদিবাসী সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে পেনশন সংস্কার বাতিল, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা, বেসরকারিকরণ নীতি বন্ধের দাবিতে ১৪ জুন দেশব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘট সফল করে।

ব্রাজিলের মতোই দেশে দেশে ক্ষমতাসীন পুঁজিবাদী সরকারগুলো অর্থনৈতিক মন্দাক্রান্ত হয়ে জনগণের জন্য প্রদত্ত বরাদ্দ কাটছাঁট করছে। শিক্ষা,স্বাস্থ্যসহ সেবাখাত বেসরকারিকরণ করছে। অতীতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও কিছুটা জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের দায়িত্ব নিত, নয়া উদারনীতি অনুসরণের ফলে আজ সে দায়িত্ব রাষ্ট্র অস্বীকার করছে, বেসরকারিকরণের মাধ্যমে পুঁজিপতিদের নিশ্চিত মুনাফালাভের ক্ষেত্রে পরিণত করছে। ব্রাজিল আজ সে পথেই হাঁটছে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। ব্রাজিলের ছাত্র-শ্রমিক জনতা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, বুক টানটান করে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ছে! চলমান আন্দোলন বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিল, ব্রাজিল মানেই শুধু বুর্জোয়া মিডিয়ায় প্রচারিত ফুটবল, পেলে, রোনালদো, সাম্বা নৃত্য, যৌনতার দেশ নয়! ব্রাজিল মানে লড়াকু তারুণ্য, প্রতিবাদী যৌবনের স্পর্ধিত দেশ! ব্রাজিল মানে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন, সামরিক একনায়কতন্ত্র, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণে রিক্ত-নিঃস্ব কিন্তু মাথা নত না করা, লড়াকু, হার না মানা জনগণেরও দেশ! ব্রাজিলের শিক্ষা ও গণআন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র-জনতাকেও পথ দেখাবে জনগণের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে!

সরকার নির্ধারিত দামে
সরাসরি চাষীর কাছ থেকে ধান ক্রয়ের দাবিতে
জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ

ধানের লাভজনক দাম নিশ্চিত করে কৃষক বাঁচাতে সরকারি ধান ক্রয় অভিযান অবিলম্বে জোরদার ও বিস্তৃত করা এবং হাটে হাটে ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরকার নির্ধারিত দামে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনার দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রঘোষিত দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি সারাদেশে মিছিল-সমাবেশ-মানববন্ধন-অবস্থানসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৬ মে বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জহিরুল ইসলাম, ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, সীমা দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশের আগে একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন এলাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "সারাদেশে আজ কৃষকের হাহাকার। বাম্পার ফলন ফলিয়েও ধানের দাম পাচ্ছে না চাষী। দুঃখে-ক্ষোভে ফসলে আগুন পর্যন্ত দিচ্ছে কৃষক। সরকার ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান গত ২৫ এপ্রিল থেকে শুরু করার ঘোষণা দিয়েছিল। অথচ এখনো অনেক স্থানে জেলা-উপজেলায় তা শুরুই হয়নি। ফলে, সরকার নির্ধারিত ধানের ক্রয়মূল্য মণপ্রতি ১০৪০ টাকা হলেও বাস্তবে কৃষকদের কাছ থেকে ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা কিনছে মণপ্রতি স্থানভেদে ৪০০-৫৫০ টাকায়। সরকারি ক্রয়ের অনুপস্থিতিতে ক্ষুদ্র কৃষকরা এভাবে লোকসানে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের পক্ষে ধান মজুদ করে রাখা সম্ভব নয়, কারণ একদিকে আয়োজনের অভাব, অন্যদিকে ঋণ পরিশোধ ও সংসার খরচ যোগানোর তাগিদ। আবার চলতি বোরো মৌসুমে সরকার শস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সাড়ে ১২ লাখ টন, এর মধ্যে দেড় লাখ টন মাত্র ধান, বাকি ১১ লাখ টনই চাল। অর্থাৎ, কৃষকের কাছ থেকে অল্প ধান কিনে সরকার প্রধানত চাল কিনবে ধানকল মালিক-চাতাল মালিক-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। এই মিল মালিকদেরই এজেন্ট হলো ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে যেটুকু ধান উপজেলা পর্যায়ের খাদ্যগুদামে কেনা হয়, তা-ও অনেক সময় প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে নেয়া হয় না, এই সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে শাসকদলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। এভাবে মিল মালিক-চাল ব্যবসায়ী-দুর্নীতিবাজ প্রশাসন-শাসক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সকলে মিলে এক মধ্যস্বত্বভোগী সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছে ধান-চালের বাজার। এর ফলে শোষিত হচ্ছে গরিব কৃষক, ভোক্তারাও মূল্যবৃদ্ধির শিকার হচ্ছে।"

বক্তারা আরো বলেন, "এবারের সংকট নতুন নয়, বছরের পর বছর এর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বাম্পার ফলনের কৃতিত্ব সরকার নেয়, কিন্তু কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করার কোনো উদ্যোগ নেই। বরং, সরকারি নীতি ও কার্যক্রম লুটেরা ব্যবসায়ী-মধ্যস্বত্বভোগী সিন্ডিকেটকেই শক্তিশালী করছে। 'কৃষক বান্ধব' বলে নিজেদের দাবি করলেও বাস্তবে সরকার কাদের স্বার্থ রক্ষা করছে, এ ঘটনা থেকে তা পরিস্কার। আওয়ামী লীগ সরকার বড় বড় ঋণখেলাপি ব্যাংক লুটেরাদের রেয়াত দেয়ার জন্য ওকালতি করছে, অন্যদিকে সামান্য ঋণের দায়ে কৃষকদের নামে লক্ষ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা দিচ্ছে। কৃষকদের প্রতিবাদকেও সহ্য করতে পারছে না এই ফ্যাসিবাদী সরকার। তাই মন্ত্রীরা বলছেন, ফসলে আগুন দেয়া সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র। আরো জোরদার আন্দোলন-গণপ্রতিরোধের পথেই কেবল এই গণবিরোধী ও স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারকে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা সম্ভব। গত কিছুদিন ধরে সচেতন ছাত্র ও দেশবাসী যেভাবে কৃষকদের সাথে সংহতি প্রকাশ করছেন, তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-জনতার এই সংহতিকে অগ্রসর করে নিতে হবে লুটেরা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে।"

রংপুর : ধানের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে ১৬ মে তারিখে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে বেলা ১১.৩০টায় ধানে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে বাসদ (মার্কসবাদী) রংপর জেলা শাখা। জেলা বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক ও কৃষক ফ্রন্ট জেলা আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে বিক্ষোভ চলাকালীন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা পার্টির সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু, কৃষক প্রতিনিধি এমদাদুল হক বাবু, আবুল কাশেম প্রমুখ।

কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের সড়ক অবরোধ : হাটে হাটে ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরকারি উদ্যোগে ১০৪০ টাকা মণ দরে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়, ক্ষেতমজুরদের সারাবছর কাজ ও আর্মিরেটে রেশন চালুর দাবিতে কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদ রংপুর জেলার উদ্যোগে ২৯ মে সকাল ১১টায় সদর উপজেলার পাগলাপীরে ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। অবরোধ চলাকালীন সমাবেশে স্থানীয় কৃষক আব্দুল ওহাবের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদ রংপুর জেলার নেতা আনোয়ার হোসেন বাবলু, আব্দুল কুদ্দুস, মফিজাল ইসলাম, আনসার আলী, আহসানুল আরেফিন তিতু প্রমুখ। *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সরকারি ব্যয়হ্রাসের প্রতিবাদে
আন্দোলনে উত্তাল ব্রাজিল

১৪ জুন। ব্রাজিলের সাওপ্রাওলো শহরে কোপা আমেরিকার উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল। আমাদের দেশের গণমাধ্যমে এখবরটিই বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। অথচ ম্যাচ শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে ধর্মঘটকারী জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষে সাওপ্রাওলো শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সাওপ্রাওলোর মতো ব্রাজিলের সমস্ত শহর ছিল সেদিন ধর্মঘটে স্তব্ধ। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী, ছাত্র-শিক্ষক-জনতা সেদিন পুরো ব্রাজিল জুড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নামে। কিন্তু প্রচলিত গণমাধ্যম দেখে কোপা আমেরিকার উদ্বোধনী খেলা ছাড়া ব্রাজিলে সেদিন আর কিছু হয়েছে কিনা, তা বোঝার উপায় নেই! অথচ ব্রাজিলের বোলসোরানো সরকার কর্তৃক পেনশন ব্যবস্থা সংস্কার, বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাদ্দ হ্রাস ও বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে সব ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন, সামাজিক সংগঠনসমূহের আহ্বানে সেদিন ব্রাজিল জুড়ে সর্বাত্মক ধর্মঘট প্রালিত হয়। ব্রাজিলের সমস্ত সড়ক-মহাসড়ক, সাবওয়ে, আন্তারপাস, বাস, রেল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, ব্যাংক, মিল-কারখানা, খনি ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঐদিন সারাদেশে প্রায় ৪৫ লক্ষ প্রতিবাদকারী বিক্ষোভে অংশ নেয়। সাওপ্রাওলো, রিউডিজেনেরিওসহ বড় শহরগুলোতে ধর্মঘটকারীদের উপর পুলিশ গ্রেনেড, রবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে। অনেকে আহত হয়। হামলা উপেক্ষা করে আন্দোলনকারীরা ধর্মঘট সফল করে।

উল্লেখ্য, উগ্র ডানপন্থী বোলসোরানো সরকার জানুয়ারিতে ব্রাজিলের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়। ক্ষমতা গ্রহণ করেই বোলসোনারো সরকার নয়া উদারনৈতিক (নিউলিবারালাইজেশন) নীতি বাস্তবায়ন শুরু করে। সরকার ঘোষণা দেয়, দেশের অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উত্তরণে সরকারি ব্যয় কমানো হবে, সেজন্য পেনশন ব্যবস্থা সংস্কার করা হবে। অবসরের ন্যূনতম বয়স পুরুষ ৬৫ বছর ও নারীদের জন্য ৬২ বছর নির্ধারণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়, যেখানে এর পূর্বে নারী-পুরুষ উভয়ের অবসরের ন্যূনতম বয়স ছিল গড়ে ৫৫ বছর । এপ্রিলে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা সরকারি ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ও গবেষণাখাতে প্রদত্ত সরকারি

বরাদ্দ ৩০% হ্রাস করা হবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও সমাজতত্ত্ব বিভাগে বরাদ্দ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হবে। বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দও ৪২% হ্রাস করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে গবেষণার জন্য প্রদত্ত ৩০০০ স্কলারশীপও আর প্রদান করা হবে না। যদি কোন বেসরকারি সংস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে চায় তাহলে তাদেরকে পাঁচ বছরের জন্য ট্যাক্স ছাড় দেয়া হবে। এপদক্ষেপগুলো থেকে স্পষ্ট, ব্রাজিল সরকার উচ্চশিক্ষা বেসরকারিকরণের পথেই হাঁটছে, যা ব্রাজিলের ছাত্র-জনতাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এছাড়া নতুন এক ডিক্রির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আরো বাড়ানো হয়, যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা হরণের পদক্ষেপ বলে শিক্ষাবিদরা অভিহিত করেছেন। ২৬ এপ্রিল বোলসোনারো এক টুইট বার্তায় লেখেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও সমাজতত্ত্ব বিভাগ তুলে দিতে হবে, কারণ এগুলো শুধু বেকারই তৈরি করছে। আমাদের ভেটেরিনারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিনের মতো সাবজেক্টকে গুরুত্ব দিতে হবে, যেগুলো দেশের করদাতাদের আশু প্রতিদান দিতে পারবে। 'সরকারের এমন উচ্চশিক্ষা বিরোধী পরিকল্পনাতে ব্রাজিলের ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ প্রতিবাদে ফুঁসে উঠে। সারাদেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ মে ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনগুলোর আহ্বানে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও রাজপথে ব্যাপক বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। সেদিন সারাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ বিক্ষোভকারী রাজপথের বিক্ষোভে সামিল হয়। শুরু হয় সরকারের রক্তচক্ষু দেখিয়ে টিয়ার গ্যাস, রবার বুলেট ছুঁড়ে, অপপ্রচার করে ছাত্রআন্দোলন দমনের চেষ্টা। ক্ষুব্ধ হয়ে প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো চলমান আন্দোলনকে 'বামপন্থীদের ষড়যন্ত্র' অভিহিত করে কঠোর হাতে বিক্ষোভ দমনের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকারও নির্দেশ দেন। তিনি আন্দোলনে অংশ নেয়া ছাত্রদের 'নির্বোধ' ও 'seful idiots' (যারা কোন একটা মত বা মতাদর্শের প্রক্ষে প্রচার চালায়, কিন্তু তার সম্পর্কে নিজেই অস্পষ্ট ও লক্ষ্যহীন থাকে, স্নায়ু যুদ্ধের সময় পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সোভিয়েত সমর্থকদের বিদ্রুপ করে এ নামে ডাকা হতো) হিসেবে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু সরকারের রক্তচক্ষু, হুমকি সত্ত্বেও আন্দোলনের শক্তি ও ঝাঁজ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ৩১ মে ২০১৯ ব্রাজিলের ২০০টি শহরে প্রায় ২০ লক্ষ বিক্ষোভকারী রাজপথে নেমে আসে। *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী । বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত ।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org